৯

ছুটির পর সাজেদা লতিফাকে বললো, আপত্তি না থাকলে, বাসায় এসে যদি সামান্য ডালভাত খেয়ে যেতেন?

লতিফা কিছু বলার আগেই, তাহমিনা বললো, আমি যাবো, বাড়ী ফিরে রান্না করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

রোকেয়া বললো, আমিও যাবো।

লতিফা বললো, সবাই যখন যেতে চাইছে, চলো, কি খাওয়াবে দেখি।

সবাইকে নিজের বাড়ীতে জড়ো করার উদ্যেশ্য হলো, রাধিকাকে নিয়ে পরচর্চা করা। সাজেদা ফ্রীজ থেকে আগের তৈরী করা খাবার গুলো রেঞ্জিতে গরম করে টেবিলের উপর সাজিয়ে খেতে বসলো সবাইকে নিয়ে। তারপর বললো, রাধিকা সিস্টারের খবর কিছু জানেন নাকি?

লতিফা বললো, হুম, ডাইরেকটর সাহেবের এক ধমকে নাকি বোবা হয়ে গেছে শুনলাম।

রোকেয়া বললো, রাধিকা সিস্টারের যে বুদ্ধি, এত সহজে মনে হয় ছেড়ে দিবে না।

লতিফা বললো, ছাড়বেনা মানে, দেখো, বাড়ীতে গিয়ে কেঁদে কেটে অস্থির হয়েছে এতক্ষনে।

তাহমিনা বললো, রাধিকা সিস্টার কাঁদলে কেমন লাগে কে জানে? আমার খুব দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

লতিফা বললো, হয়েছে হয়েছে, খাবার দাবারের সময় রাধিকা সিস্টারের কথা মনে করে খাবারের মজাটা আর নষ্ট করোনা।

সকালে ঘুম থেকে উঠে রাধিকা দেখলো, সাকীব আর দিল ঘরে নেই। সে নাস্তা রেডী করে টেবিলে সাজিয়ে রেখে, হাসাপাতালে যাবার জন্যে রেডী হতেই, দিলকে কোলে নিয়ে ঘরে ফিরে এলো সাকীব। বললো, কতদিন সকালে হাটতে যাইনা। কি চমৎকার লাগলো সকালের হাটাহাটি।

রাধিকা বললো, তুমি কি সত্যিই চাকুরী ছেড়ে দেবে নাকি?

সাকীব বললো, ছেড়ে তো দিলামই। ছেড়ে দেবো আবার কি?

রাধিকা বললো, তোমার এই পাগলামীর জন্যে ডাইরেকটর সাহেবের এতগুলো বাজে কথা শুনতে হলো আমার!

সাকীব বললো, কিছু বলেছে নাকি তোমাকে? আর বলো না ঐ মেজাজী লোকটার কথা। তার এই স্বভাবের জন্যেই তার বউ, ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে গেছে, জানো?

রাধিকা বললো, কই শুনিনি তো?

সাকীব বললো, আর বলছি কি, বাড়ীতেও সারাক্ষণ মেজাজ খারাপ করে থাকে, যার জন্যে!

রাধিকা রেগে যাবার ভান করলো। সে বললো, ডাইরেকটর সাহেব বাড়ীতে কি করছে আর না করছে, বউয়ের কি হয়েছে আর না হয়েছে, শুনতে চাইনি আমি।

রাধিকা একটু শান্ত হয়ে বললো, তুমি একবার ভালো করে ডাইরেকটর সাহেবের সাথে আলোচনায় বসো। এমন একটা পরিবেশে আমার কাজ করতে খুবি সমস্যা হচ্ছে।

সাকীব তার হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, এই যা, আটটা বেজে গেছে। দিলকে দুধ খাওয়ানোর সময় হয়ে গেলো।

সাকীব রান্না ঘরের দিকে ছুটে গেলো।

তিনশ এগারো থেকে একটা হৈ চৈ শোনা যাচ্ছে। রতন, বাদশা, বাবুল আর লোকমান সাহেব তাস খেলায় মেতে উঠেছিলো। লতিফা কক্ষের ভেতরে চুপি দিতেই, সবাই যার যার হাতের তাস বালিশের নীচে লুকিয়ে ফেলে সাধু হয়ে বসে থাকার ভান করলো। লোকমান কাৎ হয়ে ঘুমের ভান করলো।

একটা তাস বেডের উপর পরে ছিলো। লতিফা সেটা হাতে তুলে নিয়ে বললো, এটা কি?

বাদশা, রতনকে দেখিয়ে বললো, রতন খুব জোড় করে ধরলো, একটা দান শুধু খেলার জন্যে।

রতন রেগে বললো, আমি বলেছি নাকি? তুমিই না বললে?

লতিফা রেগে বললো, আপানাদের সবাইকে বলছি। এটা হাসপাতাল। হাসপাতালের নিয়মের বাইরে কোন কিছু করবেন, তা আমি আশা করবো না।

রতন আর বাদশা দুজনেই বললো, জী।

লতিফা, ঘুমের ভান ধরে থাকা, লোকমানকেও বললো, লোকমান সাহেব, আপনিও।

লোকমান বললো, জী।

মাহবুব কিছুক্ষনের জন্যে বাইরে হাটতে গিয়েছিলো। সে কক্ষে ঢুকে লতিফাকে দেখে ভরকে গেলো। লতিফা তাকে দেখে হাসিমুখে বললো, মাহবুব সাহেব, শরীর কেমন এখন?

মাহবুব বললো, জী ভালো কিছুটা।

লতিফা এবার হাসলো ভালে করে। সবাইকে উদ্যেশ্য করে বললো, সবাইকে বলছি, তাড়াতাড়ি রোগমুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবেন, এই আশা করছি।

সবাই একসংগে বললো, জী।

লতিফা বললো, তাহলে আসি।

লতিফা বেড়িয়ে যেতেই বাদশা বললো, লতিফা সিস্টার আসলে বুকটা কেমন ধকধক করে।

বাবুল বললো, আমারো।

লোকমান সাহেব উঠে বসে বললো, কেমন একটা পাষানী মহিলারে বাবা!

রাধিকা নার্স ষ্টেশনে ঢুকেই বললো, দেখি, সবাই যার যার চেয়ারে এসে বসো।

রাধিকা এদিক ওদিক তাঁকিয়ে বললো, আরে? লতিফা কোথায়?

রোকেয়া বললো, ওয়ার্ডে।

রাধিকা অবাক হয়ে বললো, ওয়ার্ডে?

ঠিক তখুনিই লতিফা এসে ঢুকলো। লতিফা কাছে আসতেই, রাধিকা বললো, কোনো সমস্যা? ওয়ার্ডে লতিফার পদাচরন, খুবই রেয়ার কেইস দেখছি?

লতিফা বললো, কেনো, যাইনা বুঝি আমি? তারচেয়ে বড় কথা। সুপারভাইজার সিস্টারের উপর দিয়ে তো অনেক সমস্যা যাচ্ছে, তো, তার কোনটির কি কোনো সমাধান হলো?

রাধিকা বললো, দুশিচন্তার কোনো কারন নেই। সবই ঠিকমতো চলছে।

লতিফা বললো, তা কি সত্যিই?

রাধিকা বললো, সত্যি।

সে সবার কাজ ব্যাখ্যা করতে যেতেই বললো, অনেকেই তো এখনো আসেনি দেখছি?

তাহমিনা বললো, অনেকেই না, শুধু রাত্রি আর সুমি।

লতিফা বললো, দেরী করে কাজে আসা, কি সব ফালতু অভ্যাস। সুমি না হয় নবাগতা, রাত্রি একটা চার বছরের পুরনো নার্স। সে লেইট করে আসে, অথচ তার কোন বিচার হয়না, বেতন কাটা যায়না, বুঝিনা কিছু।

তাহমিনা বললো, রাত্রি এই মাসে তিনবার লেইট করে এসেছে।

সাজেদা বললো, না, চারবার!

রোকেয়া বললো, এইসবের দেখাশুনা উপরের লোকেরা ঠিকমতো না করলে কি চলে? আমরা যারা সিরীয়াসলী কাজ করে যাচ্ছি, তাদেরকে বোকা বানানো হচ্ছে না?

সাজেদা, তাহমিনা মাথা নাড়লো, ঠিক ঠিক।

রাধিকা, তার রাগ আর সামলাতে পারলোনা। সে টেবিলের উপর সজোড়ে চাপর মেরে বললো, সিরীয়াসলী কাজ করে যাচ্ছি আমরা, তাই না? আমার সাথে জোক করছো? দীর্ঘদিন সহ্য করেছি। আর না। আজকে সব বলবো। রোকেয়া, সব সময় অমনযোগী থেকে ঔষধ ভুল করো, তারজন্যে তোমাকে বাঁচানোর জন্যে প্রতিটি বার কে লুকিয়ে লুকিয়ে অনুসরন করছে? সাজেদা, তুমি যে হাসপাতালের দামী দামী জিনিষগুলো হাত থেকে ফেলে ফেলে ভাঙছো, তার খবর রাখো? আর তাহমিনা, তুমি যে চুরি করে গ্লুকোজ সব খেয়ে শেষ করছো, তা মনে করেছো আমি কিছুই জানি না? এই দোষ আমার, ঐ দোষ আমার, তোমরা পেয়েছো কি আমাকে?

সাজেদা বললো, আহা থামেন সিস্টার, আমাদের ভুল হয়ে গেছে।

তারপর লতিফাকে ইশারা করলো, কিছু একটা করার জন্যে।

তুফান মেইলের সাথে সুমির বনিবনা হয়ে উঠছেনা। সুমির কেনো যেনো মনে হয়, সে নেটওয়ার্ক এডমিনিষ্ট্রেটর বলে কিছু না। কয়েকটা কম্পিউটার নিয়ে সাইবার ক্যাফে বলে, একটা দোকান দিয়ে বসেছে। ইদানীং, সাইবার ক্যাফে ব্যাবসাটা বেশ রমরমা। এই সব সাইবার ক্যাফের এডমিনিষ্ট্রেটর গুলো, নিজেরা একাধিক আই ডি ব্যাবহার করে নেটে অর্থহীন চ্যাট করে সময় কাটায়। অথচ, এমন একটা নেটওয়ার্ক এডমিনিষ্ট্রেটর, সুমিকে একটা কঠিন শর্ত দিলো। তাকে নার্সের চাকুরীটা ছাড়তে হবে।

আজ সকালে সুমিকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে বলে, গাড়ীতে বসিয়ে আবারো অনুরোধ করলো। সুমি হা অথবা না কিছুই বললোনা।

রাত্রি হাসপাতালের সামনে সি এন জি থেকে নেমে ছুটছিলো হাসপাতালের ভেতরের গেইটের দিকে। তুফান মেইল সুমিকে নিয়ে, ঠিক রাত্রির পাশে এসে গাড়ী থামালো। সে সুমিকে ঠেলে গাড়ীর ভেতর থেকে বেড় করে বললো, আর কক্ষনো যোগাযোগ করবেনা আমার সাথে।

তুফান মেইল সুমিকে নামিয়ে, গাড়ীর দরজাটা বন্ধ করে, স্টার্ট দিলো গাড়ীতে। সুমির মাথায় রক্ত উঠে গেলো। সে তার পায়ের হীলটা ছুড়ে মারলো তুফান মেইলের গাড়ীর কাঁচের জানালায়। তবে গাড়ীর জানালাটা ভাঙেনি। তাই সুমির রাগ কমলোনা। সে রাগে থর থর করছে।

সুমির এমন একটা গতি দেখে রাত্রি এগিয়ে এলো তার দিকে। সে বললো, কি ব্যাপার সুমি?

সুমির কান্না পাচ্ছিলো। সুমি রাত্রিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। রাত্রি, তার পিঠে আলতো করে চাপর মেরে বললো, কি হয়েছে তোমার?

সুমি কাঁদতে কাঁদতে শুধু বললো, সিস্টার?

ডাইরেকটর সাহেব, সাকীবকে টেলিফোনে ডকটরস ক্লাবে আসতে বললো।

কফি পান করতে করতে ডাইরেকটর সাহেব বললো, তোমার সমস্যাটা কি বলতো? হাসপাতাল থেকে যে বেতন পাচ্ছো, তাতে কি তোমার পোষায়না? যদি বলো, কতৃপক্ষকে বলে তার জন্যে কিছু একটা করার কথা ভেবে দেখবো।

কোলের উপর দিল খুব ছটফট করছিলো। সকীব, দিলকে মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে বললো, না, না, সেরকম কোন ব্যাপার না।

ডাইরেকটর সাহেব মাথা চুলকাতে চুলকাতে কি যেনো বলতে চাইছিলো। দিল হামাগুড়ি দিতে দিতে তার চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে তার পায়ের উপর হাত রাখলো। সে অনেকটা চমকে উঠলো। সাকীব হাসতে হাসতে বললো, দেখেছেন, আমাদের দিল দিন দিন কত বড় হয়ে গেছে? এখন, কিছু একটা ধরে ধরে, নিজে নিজে দাঁড়াতে পারে।

ডাইরেকটর সাহেব টেবিলের উপর চাপর মেরে বললো, এই কথা শোনার জন্যে আমি এখানে আসিনি?

প্রচণ্ড চাপরের শব্দে দিল ভয় পেয়ে গেলো। সে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলো। সাকীব ছুটে গিয়ে দিলকে কোলে নিয়ে বললো, স্যরি দিল, স্যরি। আংকেল ভয় দেখিয়েছে? এই আংকেল না? চেহারাটা মনে করে রেখো। বড় হয়ে আংকেলকে একটা কড়া ধমক দিয়ে দেবে, কেমন?

দিলের কান্না থামছেনা কিছুতেই। ডাইরেকটর সাহেব বিব্রতবোধ করতে লাগলো।

সেদিন রাতের ডিউটিতে, নার্স ষ্টেশনে তখন শুধু রাধিকা আর রাত্রি। রাত্রির ঘুমের ভাবটা এখনো রয়ে গেছে চোখে মুখে। সে বড় একটা হাই তুলতেই, রাধিকা বললো, এত লেইট করে এসে আবার হাই তুলছিস?

রাত্রি বললো, সব তো তোমার দোষে।

রাধিকা বললো, আমার দোষে?

রাত্রি বললো, হুম, কাল রাতে পেট ভরে খেতে দিলে যে। বেশী খেলে আমার ঘুম পায়।

রাধিকা বললো, বেশী তো আমিও খেয়েছিলাম। কই, অমার তো এক মিনিটও লেইট হয়নি।

রাত্রি হাসতে হাসতে বললো, সবাইকে নিজের মতো ভাববে নাতো। তুমি হলে গিয়ে, জনদরদী সিরীয়াস একজন নার্স বলে কথা!

রাধিকা, রাত্রিকে কাছে ডাকলো, বললো, রাত্রি, তুই কি আমার বর্তমান পরিস্থিতিটা টের পাচ্ছিস?

রাত্রি বললো, পাবোনা কেনো? তুমি একটা প্রকাণ্ড অগ্নিস্তুপের উপর বসে আছো, ঠিক বলিনি?

রাধিকা বললো, বুঝতেই যখন পারছিস, আমার যাতে কোন ফেইল্যুর না আসে, তার জন্যে একটু সাহায্য করবিনা আমাকে?

রাত্রি বললো, হুম।

রাধিকা বললো, ঠিক আছে, এখন বল, সুমি কোথায়?

রাত্রি বললো, সেই কখন থেকে বিশ্রামাগারে বসে বসে কাঁদছে।

রাধিকা চোখ কপালে তুলে বললো, কাঁদছে? কেনো?

রাত্রি ফিসফিস করে বললো, মনে হয় হাফসোল খেয়েছে।

রাধিকাও ফিসফিস করে বললো, তাতো খাবেই, যেই ক্যারেকটার মেয়েটার?

সুমি ঠিক তখুনিই মন খারাপ করে, ফ্যাকাশে একটা চেহারা নিয়ে ঢুকলো নার্স ষ্টেশনে।

রাত্রি সুমিকে দেখেই বললো, সুমি, তোমার টহলের সময় হয়ে আসছে।

সুমি অন্যমনস্ক ভাবে বললাম, হুঁ।

বলেই চেয়ারে গিয়ে বসলো সে।

রাধিকা, রাত্রিকে বললো, রাত্রি, টহলে বরং তুমি যাও।

রাত্রি চেচিয়ে বললো, হ্যাঁ, আমি?

রাধিকা বললো, হ্যাঁ, তুমি। এই চেহারা নিয়ে সুমি যদি টহলে যায়, হাসপাতালের বদনাম হবে।

রাত্রি বললো, ঠিক আছে, উপায় যখন নাই, আর কি করা।

রাত্রি ওয়ার্ডে ঢুকে সবার বেডের পর্দা সরিয়ে দেখতে লাগলো। মাহবুব সাহেব ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলছে। বাবুল, বাদশা, রতন সবাই বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। লোকমান সাহেবের বেডে চুপি দিতেই দেখলো, বেডে কেউ নেই। রাত্রি অস্ফুট স্বরে বললো, লোকমান সাহেব গেলো কই?

রাত্রি হঠাৎই অনুভব করলো, কে যেনো তার পা আকড়ে ধরেছে। রাত্রি চিৎকার করে উঠলো। ভয়ে সে হাতের টর্চ ছুড়ে ফেললো শূন্যে। টর্চটা গিয়ে পরলো, বাদশার মাথায়। বাদশা কঁকিয়ে উঠলো। রাত্রি ছুটে গিয়ে সবগুলো লাইট অন করে দিলো।

খাটের নীচ থেকে লোকমান হাতে এক গাদা চিতল পিঠা নিয়ে বেড়োতে বেড়োতে ডাকলো, রাত্রি, আমি, আমি। ভয় পাবে না। আমি।

রাত্রি বুকে থু থু দিয়ে এগিয়ে গেলো সেদিকে, বললো, লোকমান সাহেব, ওখানে কি করছেন? যা ভয় পেয়েছিলাম।

লোকমান অর্ধেক খাওয়া চিতল পিঠাটা কামড়াতে কামড়াতে, খাটের নীচ থেকে বেড়িয়ে এসে বললো, একটু ক্ষুধা লেগেছিলো। বাড়ী থেকে তোমার ভাবী এই চিতল পিঠাগুলো এনেছিলো। ভাবলাম খাই। দরজায় শব্দ শোনে মনে করলাম, লতিফা সিস্টার নাকি আবার? যদি রাগারাগি করে, তাই লুকিয়েছিলাম। তুমি যেনো আবার, আমাকে খোঁজাখোঁজির ঝামেলাটা না করো, তাই তোমার পা ধরে ডাকতে চেয়েছিলাম।

রাত্রি অবাক হয়ে বললো, লতিফা সিস্টার?

সবাই আসলে ঘুমের ভান করে পরেছিলো। রাত্রিকে দেখে সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়ালো।

বাবুল বললো, হ্যাঁ, খুবই রেয়ার, বাট, আজকে লতিফা সিস্টার এখানে এসেছিলো।

রাত্রি বললো, লতিফা সিস্টার বুঝি খুবই রাগারাগি করে?

রতন বললো, হুম, এরকম হাসপাতালের বাইরের জিনিষ খেতে দেখলে, সাথে সাথে সীজ করে।

রাত্রি খিল খিল করে হাসলো, বললো, তাই নাকি?

লোকমান বললো, হুম, সাংঘতিক ভয় করি আমি, ঐ মহিলাকে। রাত্রি একটা খাবে নাকি, চিতল পিঠা?

রাত্রি, লোভনীয় চিতল পিঠাগুলো দেখে, লোভ সামলাতে পারছিলোনা। সে একটা হাতে নিয়ে ভাবলো এক মুহূর্ত। তারপর সবগুলো চিতল পিঠা কেড়ে নিয়ে বললো, সীজড!

লোকমান বোকা বনে গিয়ে বললো, রাত্রি, জোক করছো তো, তাই না?

রাত্রি কঠিন গলায় বললো, না, হাসপাতালে বাইরের খাবার নিষিদ্ধ। আর এখন ঘুমোনোর সময়। সবই ঘুমোতে যান।

লোকমান অনুযোগ করে বললো, রাত্রি! এতটা পাষান হবে না।

আশেক রাশিচক্রের একটা ম্যাগাজিন খোলে বেশ মনযোগ দিয়ে পড়ছে। সে হঠাৎই আহমেদকে বললো, আহমেদ তোমার ব্লাড গ্রুপ কি?

ব্লাড গ্রুপের সাথে রাশির কোন সম্পর্ক আছে বলে আহমেদের জানা ছিলোনা। সে বললো, ও।

আশেক বিড়বিড় করে বললো, ও।

তারপর পাতা উল্টিয়ে বললো, পেয়েছি। তোমার আজকের দিনটা কেমন যাবে পড়ছি। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে। পদস্হদের সাথে সংঘর্ষ, কাজে অমনোযোগী, ভুল কিছু করার সম্ভাবনা অধিক।

আশেক পড়া থামিয়ে বললো, ভুল কিছু করেছো নাকি?

আহমেদ রাগের সাথে বললো, না।

তারপর, বিড়বিড় করে বললো, এমন পদস্হের সাথে সংঘর্ষ হলেই কি, আর না হলেই কি?

আশেক বললো, কি বললে?

আহমেদ বললো, না না, আপনাকে কিছু বলিনি।

সে তার রিপোর্টে চোখ রাখলো।

সুমি তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো। রাধিকা রোগীদের প্রেসক্রিপশন গুলো দেখে দেখে ঔষধ রেডী করতে করতে বললো, কতক্ষণ আর কাঁদবে। খুবই ভালোবাসতে বুঝি?

সুমি কাঁদতে কাঁদতে বললো, মোটেও না।

রাধিকা বললো, ভালোই যদি না বাসলে, তাহলে কাঁদছো কেনো?

সুমি বললাম, সব সময়, আমি ছেলেদের ছ্যাকা দিয়ে থাকি। এবার আমাকে ছ্যাকা দিলো দেখে কাঁদছি।

রাধিকা অবাক হয়ে বললো, মানে?

সুমি বললো, ছেলেদের সাথে ছাড়াছাড়ির সময়, আমি আগে ছ্যাকা দিবো, এটা আমার ছোটকাল থেকেই সিদ্ধান্ত নেয়া। আমাকে কেউ ছ্যাকা দিবে, ভাবতেই পারিনা। কি কষ্টের বাবা ছ্যাকা!

রাধিকা গম্ভীর হয়ে বললো, তাই? তাহলেতো ভালোই হলো। নুতন একটা অভিজ্ঞতা অর্জন হলো। নার্স হিসেবে পরবর্তীতে কাজে লাগতে পারে।

সুমি ন্যাকমী করে বললো, এরকম অভিজ্ঞতায় একটুও ভালো লাগছেনা।

রাত্রি টহল থেকে ফিরে এসেছে। তার হাতে এক গাদা পিঠা দেখে, রাধিকা বললো, আবারো কি খাওয়ার ফন্দি নাকি?

রাত্রি বললো, আরে না, লোকমান সাহেব লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছিলো। সীজ করেছি, সীজ!

টেলিফোনটা বাজছিলো। রাত্রি সুমিকে বললো, বাজছে!

সুমি বললো, আমি ধরবো?

রাত্রি ধমকে বললো, টেলিফোন রিসীভটা অন্তত করো। তোমার টহলের কাজটা আমি করে দিলাম, উজবুক কোথাকার!

সুমি টেলিফোন রিসীভ করতেই, রাত্রি পাশের বিশ্রাম কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলো।

টেলিফোনে কথা শেষ হতেই, রাধিকা সুমিকে বললো, কি ব্যাপার?

সুমি ভাঙা ভাঙা ভাবে বললো, জরুরী বিভাগে একজন রোগী এসেছে। তারপর কি জানি বললো। রোগী নাকি?

রাধিকা ডাকছে, রাত্রি, রাত্রি?

রাত্রি একটু শুতে যাবে ভেবেছিলো, সে পাশের ঘর থেকেই চেচিয়ে বললো, কি ব্যাপার?

রাধিকা বললো, তুমি একটু ইমার্জেন্সীতে যাওতো।

রাত্রি বললো, আমি পারবোনা, সুমিকে যেতে বলো।

রাধিকা চেচিয়ে বললো, যা বলছি তাই শোনো।

রাত্রি রাগ করলো, বিড় বিড় করে নিজে নিজেই বললো, ঐ উজবুকটার জন্যে, একটু বিশ্রাম করারো জো নেই।

রাত্রি জরুরী বিভাগে যেতেই, কর্তব্যরত ডাক্তার বললো, উনি আজমুল সাহেব। আগে অনেকদিন সার্জারী বিভাগে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিছুক্ষন আগে বাড়ীর টয়লেটের লাইট বদলাতে গিয়ে টুল থেকে পরে কোমড় ভেঙেছে। অথচ, আমাকে চিকিৎসা করতে দিচ্ছেনা। সার্জারীর ডাক্তার ছাড়া, কাউকে উনি বিশ্বাস করছেননা। তাই উপায় না দেখে?

রাত্রি আজমুল সাহেবের দিকে এক নজর তাঁকালো। ষাটোর্ধ এই লোকটাকে সার্জারীতে কিছুদিন দেখেছে দেখেছে মনে হয়, আবার ঠিক মনে পরছেনা। সাথে তার পঞ্চাশোর্ধ বউ। মহিলা তার দিকে তাঁকিয়ে বললো, তোমার নাম রাত্রি না?

রাত্রি গম্ভীর হয়ে বললো, হুম, তাই। ঠিক আছে, চলুন সার্জারীতে।

আশেক বাসায় ফিরে গেছে একটু আগেই। সার্জারীতে ডাক্তার বলতে, আহমেদ ছাড়া কেউ নেই। রত্রি, অজমুল সাহেবকে চিকিৎসা কক্ষের বেডে শুতে বলে, আহমেদকে নিয়ে ফিরে এলো। আহমেদ দেখলো, আজমুল সাহেব, পেটে আর পায়ে আঘত পেয়েছে। পেটের দিকে চামড়া ছিলে গেছে, আর পায়ের দিকে কেটে গেছে, বেশ খানিকটা। আহমেদ পেটের ছিলে যাওয়া অংশটার চারিদিকে আঙুল টিপে টিপে বলতে লাগলো, এখানে ব্যাথা আছে? এখানে?

আজমুল সাহেব বললো, পেটে সামান্য মলম লাগিয়ে দিলেই হবে। আপনি বরং পায়ের কাটাটা দেখুন।

আজমুল সাহেবের বউ বললো, আমি বলেছিলাম, কাল সকালে টয়লেটের লাইটটা বদলাতে। আমার কথা শুনলোনা। উনি রাতের বেলাতেই অন্ধকারে, চেয়ারের উপর টুল তোলে, বাতি বদলাতে গেলেন।

আজমুল সাহেব বললো, আমি তো তোমাকে বলেছিলাম, টুলটা শক্ত করে ধরার জন্যে। তুমি তো ধরে রাখতে পারলেনা।

আহমেদ, আজমুল সাহেবের পেটে মলম লাগিয়ে দিতে বললো রাত্রিকে।

রাত্রি বললো, একবার এক্সরে টা করে নিলে কেমন হয়?

আজমুল সাহেব বললো, না না এত ঝামেলার দরকার নেই। পায়ের ঐ রক্ত পরাটা বন্ধ হলেই যথেষ্ট। ভালো কথা ডাঃ সাকীব নাই আজকে?

আহমেদ বললো, উনি এখন বাড়ীতে।

সে আজমুল সাহেবের পায়ের দিকে এগিয়ে যেতেই, রাত্রি বললো, আমার মনে হয়, এক্সরে টা করে নেয়া উচিত।

আহমেদ চোখ লাল করে তাঁকালো রাত্রির দিকে।

রাত্রি চুপ করে গেলো।

আজমুল সাহেবের বউ বললো, ডাক্তার সকীব হলো, উনার কাছে দেবতার মতো। উনার কথামতো, ডাক্তার সকীবকে দেখলেই নাকি রোগ অর্ধেক ভালো হয়ে যায়।

আহমেদ আজমুল সাহেবের পা ব্যাণ্ডেজ করতে করতে বললো, তাই নাকি?

আজমুল সাহেবরা বিদায় হতেই, আহমেদ আর রাত্রি চিকিৎসা কক্ষ থেকে বেড়িয়ে বারান্দা ধরে হাটতে লাগলো। হাটতে হাটতে আহমেদ রাত্রিকে বললো, কি শিখেছো এসব, ডাক্তারের উপরে কথা বলা? তুমি হলে নার্স, নার্সের মতো থাকবে।

রাত্রি আহমেদের কথা কিছুই বুঝতে পারলোনা। সে বললো, মানে?

আহমেদ বললো, মানে আর কি? এক্সরে করা দরকার, এটা সেটা। চিকিৎসা হলো ডাক্তারের কাজ। এরকম ডাক্তারের উপর কথা বলা বন্ধ করবে?

রাত্রি বললো, তুমি মিছে মিছি আমার উপর রাগ করছো কেনো? আমিতো?

আহমেদ রাত্রিকে থামিয়ে বললো, ঐদিনের কথা ভুলে গেছো নাকি?

রাত্রি বললো, কোনদিনের কথা?

আহমেদ বললো, কোনদিনের কথা আবার? ঐ দিন রাধিকা সিস্টারের সাথে খেতে গিয়ে, এমন পেট ভরে খেয়েছো, বাসায় যাবার সময় মাথা ঘুরে পরে গেলে।

রাত্রি বললো, কই মনে পরছেনা, তারপর?

আহমেদ বললো, তারপর আবার কি? তোমাকে ধরে ধরে বাসায় নিয়ে গেলাম, আর তুমি?

রাত্রি বেশ কৌতুহল নিয়ে বললো, আর আমি?

আহমেদ বললো, আর তুমি বমি করে দিলে। আমার কাপর চোপর সব নষ্ট করে দিলে।

রাত্রি খিল খিল করে হাসলো, তাই নাকি?

আহমেদ রাগ করার ভান করলো। বললো, হাসবেনা। আমার পোষাক নষ্ট করেছো। তারপর তোমর ঘর সব আমি পরিস্কার করেছি। খাওয়ার সময় আরেকটু ভেবে চিন্তে খাবে।

আহমেদ হন হন করে হেটে চলে গেলো।

রাত্রি অনেক ভাবলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর নিজে নিজেই বললো, একদম মনে পরছেনা।

চলবে